

বুটেন যেভাবে আরববিশ্বকে বিভক্ত করেছিল

ফিচারড | [Admin](#)

আরব বিশ্বজুড়ে উসমানী খিলাফতের বিলুপ্তি ঘটিয়ে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রক্রিয়া ছিল এক মর্মান্তিক ঘটনা। একশো বছর আগেও অধিকাংশ আরব অঞ্চল উসমানী খিলাফতের অংশ ছিল। উসমানী খিলাফত ছিল একটি বিশাল বহুজাতিক রাষ্ট্র, যার কেন্দ্র বা রাজধানী ছিল ইস্তাম্বুল। বর্তমানে আরব বিশ্বের মানচিত্র খুবই জটিল একটি গোলকধাঁধার মতো মনে হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের কিছু জটিল ঘটনা উসমানী খিলাফতের পতন এবং নতুন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটায়। নবসৃষ্ট এসব রাষ্ট্রের নিজস্ব সীমানা বা বর্ডার ছিল যা গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে বিভক্ত এবং মুসলিমদেরকে একে অন্যের থেকে আলাদা করে ফেলে। এই ঘটনার পেছনে অনেক কারণ থাকলেও, বুটেনের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। সেই সময়ে বুটেনের বিবাদমান ৩ পক্ষের সাথে সই করা ৩ টি আলাদা চুক্তিতে পরস্পর বিরোধী অঙ্গীকার ছিল। চুক্তিগুলোর ফলে মুসলিম বিশ্বের একটি বিশাল অংশ বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে।

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা:

১৯১৪ সালের গ্রীষ্মে ইউরোপজুড়ে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। শত্রু-মিত্র নির্ণয়ের জটিল প্রক্রিয়া, অস্ত্রের প্রতিযোগিতা, ঔপনিবেশিক বাসনা ও সরকারগুলোর উচ্চপর্যায়ে অব্যবস্থাপনা প্রভৃতি মিলিয়ে এই প্রয়লংকারী যুদ্ধের সূচনা ঘটায়। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত চলা এই যুদ্ধে প্রায় ১.২ কোটি লোকপ্রাণ হারান। যুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে ছিল বুটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং অক্ষশক্তিতে ছিল জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি।



প্রথমদিকে উসমানী খিলাফত নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। কেননা তারা যুদ্ধরত জাতিগুলোর মত ততোটা শক্তিশালী ছিল না এবং নানা আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যায় আক্রান্ত ছিল। ১৯০৮ সালে শেষ শক্তিশালী খলীফা আব্দুল হামিদ দ্বিতীয় কে “৩ পাশা” (তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যুদ্ধমন্ত্রী, নৌমন্ত্রী) উৎখাত করে এবং সামরিক শাসন জারি করে। এরপর থেকে খলীফা পদটি শুধুমাত্র প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হত। এই “৩ পাশা” ছিল ধর্মনিরপেক্ষ এবং পশ্চিমা ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী “তরুণ তুর্কী” গ্রুপের সদস্য। অন্যদিকে, উসমানীরা ইউরোপের নানা শক্তির কাছে বিরাট অক্ষের ঋণের জালেও আবদ্ধ ছিল, যা তারা পরিশোধে অক্ষম ছিল। এই ঋণ থেকে মুক্তি পবার লক্ষ্যে শেষপর্যন্ত

উসমানীয়রা এই বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। উসমানীয়রা প্রথমে মিত্রশক্তিতে যোগদানে ব্যর্থ হয়ে পরবর্তীতে ১৯১৪ সালের অক্টোবরে অক্ষশক্তিতে (অর্থাৎ ব্রিটেন, ফ্রান্স রাশিয়ার বিরুদ্ধে এবং জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির পক্ষে) যুদ্ধে যোগদান করে।

এর ফলশ্রুতিতে, বৃটেন তৎক্ষণাৎ উসমানী খিলাফতকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার এবং মধ্যপ্রাচ্যে তাদের নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারের নীলনকশা করতে শুরু করে। বৃটেন ১৮৮৮ সাল থেকে মিশর এবং ১৮৫৭ সাল থেকেই ভারতকে দখল করে নিয়েছিল। উসমানী খিলাফতের অবস্থান ছিল ব্রিটেনের এই দুই উপনিবেশ এর ঠিক মাঝখানে। ফলে বিশ্বযুদ্ধের অংশ হিসেবে উসমানী খিলাফতকে উচ্ছেদ করতে বৃটেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে।

- আরব বিদ্রোহ:

ব্রিটেনের অন্যতম বড় পরিকল্পনা ছিল উসমানী খিলাফতের আরব জনগণকে উস্কে দেয়া। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরব উপদ্বীপের পশ্চিমের এলাকা হিজাজের একজন ব্যক্তিকে তারা তৎক্ষণাৎ পেয়েও যায়। মক্কার গভর্নর শরীফ হুসেইন বিন আলী উসমানী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার শর্তে বৃটেনের সাথে চুক্তি করে। শরীফ হুসেইন নিজের মুসলিম ভাইদের সাথে যুদ্ধ করার এই ব্রিটিশ পরিকল্পনায় কেন অংশ নিয়েছিলেন তার নিশ্চিত কারণ জানা যায় নি। সম্ভাব্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে: ৩ পাশা কর্তৃক তুর্কী জাতীয়তাবাদ (এবং সেকুলারিজম) বাস্তবায়নের চেষ্টায় তার অসন্তোষ, উসমানী সরকারের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ অথবা নিজের সাম্রাজ্য গড়ে তোলার মনোবাসনা।

যে কারণেই হোক না কেন, বৃটেনের সাহায্যপুষ্ট হয়ে শরীফ হুসেইন উসমানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রস্তুতি নিলেন। অন্যদিকে, বৃটেন বিদ্রোহীদেরকে টাকা ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়, কেননা টাকা ও অস্ত্র ছাড়া উসমানীদের সুসংঘটিত বাহিনীর সাথে পেড়ে ওঠা কষ্টকর ছিল। ব্রিটেন তাদের এও প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যুদ্ধের পর শরীফ হুসেইনকে ইরাক ও সিরিয়া সহ গোটা আরব উপদ্বীপ মিলিয়ে একটি বিশাল আরব রাজ্য শাসন করতে দেয়া হবে। দুইপক্ষ (বৃটেন ও শরীফ) এর মধ্যকার এ সম্পর্কীয় আলাপ-আলোচনা ও দর কষাকষি বিষয়ক চিঠিগুলো ইতিহাসে McMahon-Hussein Correspondence (ম্যাকমেহন-শরীফ পত্রবিনিময়) নামে পরিচিত।

এই ম্যাকমেহন হলেন মিশরের তৎকালীন ব্রিটিশ হাই কমিশনার স্যার হেনরি ম্যাকমেহন, যার সাথে শরীফের গোপন আঁতাত চলছিল।



১৯১৬ এর জুনে, শরীফ হুসেইন তার সশস্ত্র আরব বেদুইনদের নিয়ে যুদ্ধে বেড়িয়ে পড়েন। কয়েক মাসের মধ্যেই বৃটিশ সেনা ও নৌবাহিনীর সহায়তায় আরব বিদ্রোহীরা মক্কা ও জেদ্দা সহ হিজাজের বেশ কয়েকটি শহর দখল করে নিতে সক্ষম হয়। ব্রিটেন সৈন্য, টাকা, অস্ত্র, পরামর্শদাতা (যার মধ্যে অন্যতম ছিল বিখ্যাত “লরেন্স অফ এ্যারাবিয়া”), এবং একটি পতাকা দিয়ে বিদ্রোহীদের সহায়তা করে। মিশরে অবস্থানরত বৃটিশরা বিদ্রোহীদের একটি পতাকা বানিয়ে দেয় যা “আরব বিদ্রোহীদের পতাকা” নামে পরিচিত ছিল। এই পতাকা-ই পরবর্তীতে অন্যান্য আরব দেশ যেমন: জর্ডান, ফিলিস্তিন, সুদান, সিরিয়া, কুয়েতের পতাকা তৈরিতে মডেল (আদর্শ) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।



ছবি- দেশগুলোর পতাকা

১৯১৭ থেকে ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, আরব বিদ্রোহীরা উসমানীদের থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করে নিতে সক্ষম হয়। একদিকে বৃটেন বাগদাদ ও জেরুজালেম দখল করে ইরাক ও ফিলিস্তিনে তাদের অবস্থান জোরদার করে, অন্যদিকে আরব বিদ্রোহীরা আন্মান ও দামেস্ক দখল করে বৃটেনকে তাদের কাজে সাহায্য করতে থাকে।

এখানে জেনে রাখা জরুরি যে, অধিকাংশ আরব জনগোষ্ঠীরই এই আরব বিদ্রোহে কোন সমর্থন ছিল না। এটি ছিল (ক্ষমতালোভী) কতিপয় নেতার নেতৃত্বাধীন একটি ছোট আন্দোলন যা ঐ নেতাদের নিজস্ব ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছিল। অধিকাংশ আরব জনগোষ্ঠী এই যুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে এবং উসমানী বা বিদ্রোহী কোন পক্ষকেই সমর্থন দেয় নি। শরীফ হুসেইনের আরব রাজ্য বানানোর বাসনা এতদিন ঠিকভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু বৃটেনের সাথে অন্যান্য পক্ষের করা প্রতিশ্রুতিগুলো এবার বাঁধ সাধল।



- (syches-picot)সাইকস-পিকোট চুক্তি:

আরব বিদ্রোহ শুরু হবার আগেই এবং শরীফ হুসেইন তার আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে বৃটেন ও ফ্রান্সের অন্য পরিকল্পনা করা ছিল। ১৯১৫-১৬ এর শীতকালে, বৃটেনের স্যার মার্ক সাইকস ও ফ্রান্সের ফ্রান্সিস জর্জেস পিকোট উসমানী খিলাফত পরবর্তী আরব বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণ করতে গোপনে মিলিত হন।

বৃটেন ও ফ্রান্স পুরো আরব বিশ্বকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়ার ব্যাপারে চুক্তি করে, যা পরবর্তীতে সাইকস-পিকোট চুক্তি নামে পরিচিতি লাভ করে। বৃটেন বর্তমানে জর্ডান, ইরাক, কুয়েত নামে পরিচিত এলাকাগুলোর দখল নেয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। ফ্রান্স পায় বর্তমান সিরিয়া, লেবানন ও দক্ষিণ তুরস্ক। জায়েনিস্টদের(জায়েনবাদী) ইচ্ছাকে এখানে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে ফিলিস্তিনের দখল নেয়ার বিষয়টি পরবর্তীতে ঠিক করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বৃটেন ও ফ্রান্সের দখলকৃত অঞ্চলগুলোর কিছু কিছু জায়গায় আরবের সীমিত মাত্রায় স্বায়ত্তশাসন দেয়ার কথা থাকলেও, ইউরোপীয় শাসন ব্যবস্থাই তাদের উপর কর্তৃত্বশীল থাকবে। চুক্তি অনুযায়ী, অন্যান্য এলাকায় বৃটেন ও ফ্রান্স সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব করার অধিকার পায়।

যদিও এটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মধ্যপ্রাচ্যে করণীয় বিষয়ক একটি গোপন চুক্তি ছিল, কিন্তু ১৯১৭ সালে রাশিয়ান বলশেভিক সরকার একে সবার সামনে উন্মোচন করে দেয়। এই সাইকস-পিকোট চুক্তি ও শরীফ হুসেইনকে দেয়া বৃটেনের প্রতিশ্রুতির মধ্যে স্পষ্ট বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে, বৃটেন ও আরব বিদ্রোহীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এটিই বৃটেনের করা সর্বশেষ পরস্পর বিরোধী চুক্তি ছিল না, নাটকের চিত্রনাট্যের এখনো কিছু অংশ বাকি ছিল।

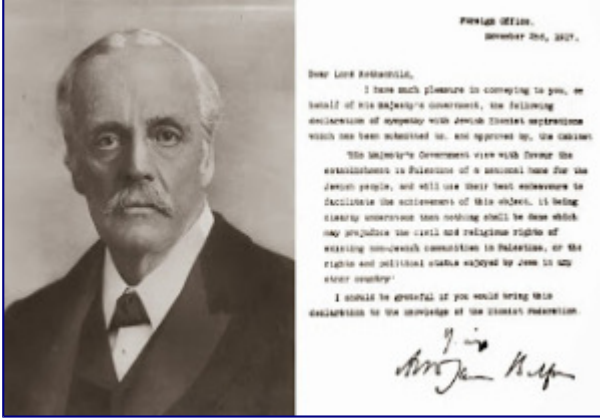
- বেলফোর ঘোষণা:

আরেকটি সম্প্রদায়েরও মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক দৃশ্যপটের দিকে শ্যেনদৃষ্টি ছিল এবং তারা হল জায়েনবাদীরা (ইহুদী)।

জায়েনিজম হল একটি রাজনৈতিক আন্দোলন যা ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে ইহুদি রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতো। এই আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯ শতকে এবং এর লক্ষ্য ছিল ইউরোপের ইহুদিদের জন্য(যারা ছিল মূলত পোল্যান্ড, জার্মানি, রাশিয়ার বাসিন্দা) ইউরোপের বাইরে একটি

আবাসভূমি খুঁজে বের করা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জায়েনিস্টরা বৃটেন সরকারের কাছে যুদ্ধ পরবর্তীতে ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনের ব্যাপারে সাহায্য চায়। অন্যদিকে, বৃটিশ সরকারের ভিতরেও এমন অনেক কর্মকর্তা ছিলেন যারা এই রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব আরথার বেলফোর। ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বরে, বেলফোর (ইহুদিবাদি) জায়েনিস্ট সম্প্রদায়ের নেতা ব্যারন রসথচাইন্ডকে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। এই চিঠিতে তিনি ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের সরকারী সমর্থন রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।



“মহামান্য (বৃটিশ রাজার) সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য একটি জাতীয় বসতি স্থাপনের ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে তার পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এটা পরিস্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে, এমন কিছুই করা হবে না যাতে ফিলিস্তিনে বিদ্যমান অ-ইহুদি (অন্যান্য ধর্মাবলম্বী) সম্প্রদায়ের নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, অথবা অন্য কোনো দেশে বসবাসকারী ইহুদিদের উপভোগ্যকৃত অধিকার ও রাজনৈতিক অবস্থানের ক্ষতিসাধন হয়”

- তিনটি পরস্পরবিরোধী চুক্তি:

ফলে দেখা গেল, বৃটেন ১৯১৭ সালের মধ্যেই তিন তিনটি ভিন্ন পক্ষের সাথে তিনটি আলাদা চুক্তি করলো এবং এই তিনটি ভিন্ন চুক্তিতে আরব বিশ্বের ভবিষ্যতের ব্যাপারে তিনটি ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হল।

- (১) বৃটেন আরবদেরকে আশ্বাস দিল, তারা শরীফ হুসেইনের মাধ্যমে আরব রাজ্যের কর্তৃত্ব পাবে,
- (২) অন্যদিকে ফ্রান্স এবং বৃটেন চুক্তি করলো, ঠিক ঐ এলাকাগুলোই বৃটেন এবং ফ্রান্স ভাগ করে নিবে।
- (৩) আবার বেলফোর ঘোষণা অনুযায়ী জায়েনবাদীরা (ব্রিটেন তথা ইউরোপিয়ানদের সাহায্যে) ফিলিস্তিন পাওয়ার আশা করলো।

১৯১৮ সালে মিত্রশক্তির বিজয়ের মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে এবং ফলশ্রুতিতে উসমানী খিলাফতের ধ্বংস ঘটে। যদিও উসমানীরা ১৯২২ পর্যন্ত নামে মাত্র টিকে ছিল এবং খলীফার পদটি ১৯২৪ সাল পর্যন্ত নামমাত্র ভাবে টিকে ছিল, যুদ্ধপরবর্তী সময়ে উসমানীদের অধীনে থাকা সব অঞ্চল ইউরোপিয়ানদের উপনিবেশে পরিণত হয়। যদিও যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের ভাগ্য তিন পক্ষের পরস্পরবিরোধী বিতর্কের মধ্যে আটকা পড়ে যায়।

তাহলে কোন পক্ষ অবশেষে বিজয় লাভ করেছিল?

প্রকৃতপক্ষে কেউ-ই তাদের পূর্ণ চাহিদা মোতাবেক সবকিছু পায় নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে লিগ অব নেশনস (জাতিসংঘের আদি

রূপ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। লিগ অব নেশন্সের অন্যতম দায়িত্ব ছিল, বিজিত উসমানী অঞ্চলগুলোকে ভাগ বাটোয়ারা করে দেয়া। লিগ অব নেশন্স সম্পূর্ণ আরব বিশ্বকে অনেক ভাগে বিভক্ত করে ফেলে (যাকে মেন্ডেট বলা হয়)। এসব মেন্ডেট বৃটেন ও ফ্রান্স এর হাতে তুলে দেয়া হয় এবং মেন্ডেটগুলো ব্রিটেন ও ফ্রান্স দ্বারা শাসিত হবে যতদিন না ঐ ছোট অঞ্চলটি বা মেন্ডেটটি নিজেই নিজের দায়িত্ব নেবারব্যাপারে সামর্থ্যবান হয়। এই লিগ অব নেশন-ই সর্বপ্রথম মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বিভিন্ন সীমানা আরোপ করে দেয়, যা আমরা বর্তমানে মানচিত্রে দেখতে পাই। এই সীমানাগুলো স্থানীয় জনগণের কোনপ্রকার মতামত ছাড়াই আরোপ করা হয়।

জাতিগত, ভৌগোলিক অথবা ধর্মীয় কোন পরিচয়ই বিবেচনায় আনা হয় নি, অর্থাৎ তা ছিল সম্পূর্ণ স্বৈচ্ছাচারী একটি সিদ্ধান্ত। এটা জেনে রাখা জরুরি যে, আরব বিশ্বের এই রাজনৈতিক সীমানা কোনভাবেই বিভিন্ন জাতির উপস্থিতি নির্দেশ করে না। ইরাকি, সিরিয়, জর্ডানি ইত্যাদি পার্থক্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় ঔপনিবেশবাদীদের কর্তৃক তৈরি করা হয় আরবদেরকে নিজেদের মধ্যে বিভক্ত করে ফেলার পদ্ধতি হিসেবে। এই মেন্ডেট সিস্টেমের মাধ্যমে বৃটেন এবং ফ্রান্স মধ্যপ্রাচ্যের উপর তার কাক্ষিত দখল বুঝে পায়। অন্যদিকে শরীফ হুসেইনের ক্ষেত্রে, তার ছেলেরা বৃটিশদের ছায়াতলে থেকে শাসনকাজ পরিচালনার সুযোগ পায়। প্রিন্স ফয়সালকে সিরিয়া ও ইরাকের রাজা করা হয় এবং প্রিন্স আব্দুল্লাহকে করা হয় জর্ডানের রাজা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৃটেন এবং ফ্রান্স-ই এইসব এলাকার প্রকৃত কর্তৃত্ব ছিল।

অন্যদিকে, বৃটেন সরকার জায়োনবাদীদেরকে কিছু শর্তসাপেক্ষে ফিলিস্তিনে বসতি গড়ার অনুমতি দেয়। বৃটেন সেখানে আগে থেকে বসবাসকারী আরবদের রাগান্বিত করতে চায় নি, তাই তারা ফিলিস্তিনে আসা দেশান্তরিত ইহুদীদের সংখ্যাসীমা বেঁধে দেয়। এর ফলে জায়োনবাদীরা ক্ষেপে ওঠে, ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ইহুদীরা বৃটেনের শর্ত না মেনেই ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনকারীর সংখ্যা বাড়াতে থাকে। এসব ঘটনা আরবদের ক্ষোভও বাড়িয়ে দেয়, কেননা তাদের কাছে ফিলিস্তিন ছিল এমন একটি ভূমি যা ১১৮৭ সালে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির বিজয়ের পর থেকে তাদের নিজেদের ছিলো এবং এখন তা বসতি স্থাপনের ফলে ইহুদীদের বলপূর্বক দখলে চলে যাচ্ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা বৃটেন মধ্যপ্রাচ্যে তৈরি করেছিল তা আজও বিদ্যমান।

পরস্পরবিরোধী চুক্তিগুলো এবং এর ফলে সৃষ্ট আলাদা আলাদা দেশগুলো মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করে। এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। জায়োনিজমের উত্থান ও মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্যের ফলে গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে জালিম সরকারের উপস্থিতি ও অর্থনৈতিক পতন দেখা দিয়েছে। যদিও এই বিভাজনটি গত ১০০ বছরের ছোট পরিক্রমার ভেতরে তৈরি করা হয়েছে, তথাপি বৃটেন এর তৈরি করা এই বিভেদ মুসলিম বিশ্বে আজো শক্তিশালীভাবে বিরাজ করছে।

Bibliography:

Hourani, Albert Habib. A History Of The Arab Peoples. New York: Mj Books, 1997. Print.

Ochsenwald, William, and Sydney Fisher. The Middle East: A History. 6th. New York: McGraw-Hill, 2003. Print.

মূল: Lost Islamic History হতে নেয়া এক প্রবন্ধ

বাংলা অনুবাদঃ returnofislam.blogspot.com

সম্পাদনাঃ সরল পথ ওয়ার্ডপ্রেস